শৈশবকালের ঢাকা
ও
অন্যান্য

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম

ঐতিহ্য

প্রাসঙ্গিকী

দুই যুগ আগে ১৯৯৯ সালের ১৮ জুলাই সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। ভেবেছিলেন অবসর জীবনে পড়াশুনা ও লেখালেখি করেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গেল।

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম পেশাগত জীবনে নানা উচ্চপদে যেমন কাজ করেছেন, তেমনি সান্নিধ্যে এসেছেন দেশ-বিদেশের বহু গুণিজনের। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাজীবন শেষ করে ঢাকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর প্রথম চাকরি জীবন শুরু হয়। তারপর সরকারি চাকরি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে থেকে অনেক জায়গায় রাষ্ট্রদূত এবং একসময় দু'বছরের জন্য তথ্যমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর শেষ পদটি ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত। যেখানে যখন থেকেছেন তাঁর পড়াশুনা ও লেখালেখি থেমে থাকেনি। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর লেখাতে আছে 'ভাষার উপর সাবলীল দখল ও চিন্তার স্বকীয়তা উভয়ই ছিল উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ও বাংলা দু'ভাষার উপরই হাশেমের যেমন সহজ আধিপত্য ছিল তেমনটা আমাদের খুব বেশি লোকের মধ্যে দেখা যায় না।'

জীবিতকালে সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম শুধু লিখেই গেছেন। বই প্রকাশের কথা কখনো ভাবেননি। তাই তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও সীমিত। তাঁর বন্ধু ও সুহৃদদের অনুরোধে, কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্'র 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল ১৯৮৩ সালে। এটি ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই। বইটির একদিকে বাংলা ও একদিকে ইংরেজি সংযোজন করা হয়েছিল। এর প্রায় ১০ বছর পর পাকিস্তানের বন্দি শিবিরে আটককালীন প্রতিদিনের ডায়রির পাণ্ডুলিপি দেখে মফিদুল হক আগ্রহ প্রকাশ করেন বই আকারে বের করার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে সাহিত্য প্রকাশ থেকে 'বন্দিশালা পাকিস্তান' নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর সাহিত্য প্রকাশ থেকেই 'অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায় : স্মৃতিপটে শেখ মুজিব' বইটি বের হয়।

হাশেমের জীবিতকালে সাংবাদিক মাহবুবুল আলম এবং অনুরাগীদের আগ্রহে পুস্তকা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পায় 'সমুদ্যত দৈব দুর্বিপাকে'। সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম সারাজীবন লেখালেখির মধ্যেই কাটিয়েছেন। দেশে-বিদেশে চাকরিসূত্রে যেখানেই তিনি থেকেছেন, তাঁর কলম কখনো থেমে থাকেনি। এখনও বুকশেলফে

সযত্নে শোভা পাচ্ছে তাঁর বহু অপ্রকাশিত লেখা। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এসব পাণ্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশ করার বাসনা আমার মনে অহরহ নাড়া দিত। তাই তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর অনুরাগীদের সহযোগিতায় কবি শামসুর রাহমানের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'The Devotee, the combatant : Selected Poems of Shamsur Rahman.' বইটি প্রকাশ করতে সক্ষম হই। এছাড়া তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে 'সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছিল বহু ভক্তের আগ্রহে ও আন্তরিক সহযোগিতার ফলে। এরপর মফিদুল হক আরও একটি বই প্রকাশ করেন, কিশোর উপন্যাস 'গলদা দাদার গোয়েন্দাগিরি'; বইটি রূপকথার আদলে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। তারপর বের হয় স্বরচিত ইংরেজি কবিতার বই 'Hopefully the Pomegranate.' অধ্যাপক নিয়াজ জামান নিজে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন তাঁর প্রকাশনা সংস্থা 'রাইটার্স ইন্‌ক্' থেকে। সর্বশেষ প্রকাশনা সংস্থা শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত হয় 'রাশিয়ার দিনলিপি' (২০১১)।

'রাশিয়ার দিনলিপি' প্রকাশ হওয়ার পর শুদ্ধস্বর-এর প্রকাশক আহমেদুর রশীদ এবং কবি পিয়াস মজিদ ও তারেক রহিমের আগ্রহে সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের কিছু অপ্রকাশিত লেখার সংকলন বই আকারে প্রকাশ হতে চলেছে। আমি আমার অন্তর থেকে তাদের ধন্যবাদ জানাই। তাদের আগ্রহ ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিশিষ্ট কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের প্রতি; অতি অল্প সময়ে এই বইয়ের একটি মূল্যবান ভূমিকা তিনি লিখে দিয়েছেন।

নাজমুদ্দীন হাশেমের বহু ইংরেজি প্রবন্ধ বাক্সবন্দি করা আছে। লেখাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাষার দখলও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। কিছু লেখা অনেক ইংরেজি পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে বের হয়েছে। ভবিষ্যতে ইচ্ছা রইল ইংরেজি সংকলনের একটি বই প্রকাশ করার। যারা বইগুলি প্রকাশ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন বলেই তাঁরা আমাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছেন। সবাইকে জানাই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

ফেব্রুয়ারি ২০১৩

ঐতিহ্য সংস্করণ প্রসঙ্গে

খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা *ঐতিহ্য* সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের *রাশিয়ার দিনলিপি* বইটি অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ এ পুনঃপ্রকাশের পর *শৈশবকালের ঢাকা ও অন্যান্য* বইটিও নতুন করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে *ঐতিহ্য*-এর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

নূরুন্নাহার হাশেম বুলু

কিছুকথা

নূরুন্নাহার হাশেম আমাকে এই বই নিয়ে ভূমিকা লিখতে বলেছিলেন বলে আমি লিখছি, বিষয়টি তা নয়। বুলু আপার অনুরোধের পাশাপাশি আমি লেখার জন্য প্রবল তাগাদা অনুভব করেছিলাম। নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে কিছু লেখা আমার প্রিয় প্রসঙ্গ।

কারণ আমি সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের প্রবন্ধের একনিষ্ঠ পাঠক। তাঁর প্রবন্ধ পড়া থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করিনি। যখনই পেয়েছি, পড়েছি। পত্রিকার পাতা থেকে বইয়ের পৃষ্ঠা, বাদ যায়নি।

পিয়াস মজিদ সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের অগ্রন্থিত এই প্রবন্ধ সংকলনের নাম রেখেছেন 'শৈশবকালের ঢাকা ও অন্যান্য'। এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধটি পড়লে পাঠক বুঝবেন তাঁর প্রবন্ধের ব্যাপকতা ও গভীরতার বিস্তার কত দীপ্ত। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় শুধু নির্দিষ্ট বিন্দুতে সীমিত থাকে না। তার মাত্রা অনেক। পাঠকের জানার তৃষ্ণা ভরিয়ে দেয়।

বইয়ের প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'শৈশবকালের ঢাকা শহর'। তিনি শুরু করেছেন তাঁর জীবনের দুই দশক ঢাকায় কাটানোর জায়গার নাম উল্লেখ করে। তিন লাইন পরে চলে গেছেন আর্মেনিয়া সফর প্রসঙ্গ ধরে জাতিগোষ্ঠী আর্মেনীয়দের অতীত ইতিহাসে। সেখান থেকে খুঁজে এনেছেন ঢাকার আর্মানিটোলা এলাকার নাম। যেখানে একসময় বাস করেছিল গালিচা ব্যবসায়ীদের বংশধর বিত্তশালী আর্মেনীয়রা। এভাবে শৈশবের সূত্রকে স্থাপন করেছেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ঢাকা শহরে বসবাসের প্রসঙ্গে। নিঃসন্দেহে এ এক অন্যচোখে শৈশবকে দেখা। শেষ করেছেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা বলে। যেখানে 'আত্মঘাতী দ্বিখণ্ডিত অসামাজিকতা নিরপরাধ উত্তরসূরিদের জীবনও বিষিয়ে তুলেছে।'

এভাবে সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম জীবন ও জগতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের লেখার মাধ্যমে মানবিক অপরাধের বিরুদ্ধে ঘৃণা উচ্চারণ করেন। তাঁর প্রবন্ধের শিল্পিত বুনন সামাজিক অঙ্গীকারের মহাসমুদ্রে যুক্ত হয়।

এই সংকলনে ছোট-বড় একুশটি লেখা আছে। 'একুশের স্বরূপ সন্ধান' মাত্র আড়াই পৃষ্ঠার একটি লেখা। কিন্তু যখন শেষের লাইন কয়টি পড়ি তখন বুঝতে পারি যে এ লেখা আড়াই পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নেই। এই লেখার আয়তন মাপা কঠিন। তিনি লেখেন, 'একুশকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এজন্যই এত প্রয়োজন, কারণ আদর্শের জন্য

আত্মোৎসর্গের সেই স্ফটিকস্বচ্ছ আরশিতে নিজেদের স্বরূপ আমরা নিরন্তর অবলোকন করে সাহস সঞ্চয় করতে পারি আগামীর বাঁচার বহু লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য'। এরকমই তাঁর প্রবন্ধের বিস্তার। 'এবং শওকত ওসমান' মাত্র দেড় পৃষ্ঠার প্রবন্ধ। কিন্তু শওকত ওসমানের সবটুকু উঠে আসে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে। শেষে যখন শওকত ওসমানের গল্পের বিষয় উঠিয়ে আনেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বর্ণনায় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কতটা পাঠঋদ্ধ বোদ্ধা লেখক তিনি।

বইয়ের একুশটি লেখাই বিচিত্র ধরনের। লেখকের ভাবনার ভুবন যে কত বিচিত্রকৌণিক তার প্রকাশ দেখা যায়। এই সংকলনে বেশ কয়েকটি বইয়ের আলোচনা আছে। তাঁর পাঠের বৈচিত্র্য ঈর্ষণীয়। অন্যদিকে বিশ্লেষণী দক্ষতা অসাধারণ। 'স্তালিনের মৃত্যু ও মানবতার মুক্তির বোধন' এমন একটি প্রবন্ধ যেখানে স্তালিনের শাসনকালীন রাশিয়ার পরিস্থিতি মূল্যায়ন শুধু তাত্ত্বিক ফ্রেমে বাঁধা থাকেনি, বরং এর দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ভিন্ন ধরনের ভ্রমণ সম্পন্ন হয় পাঠকের। 'যুদ্ধোত্তর বিশ্বচলচ্চিত্র প্রসঙ্গে লেখাটি লেখকের আর এক মানসিক দিকবলয়। শিল্পকলার বোধটি তাঁর মননে স্থির থাকে বলে প্রতীয়মান হয়। 'জ্ঞানসূর্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' তাঁর বক্তৃতার অনুলিপি হলেও এখানে তাঁর প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতার কমতি হয়নি। যে কথাটা অনেকে সাধারণ করে বলেন, তিনি তার মধ্যে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেন। ব্যাপ্তিতে-গভীরতায় তার নানাদিক ফুটে ওঠে।

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম একজন অসাধারণ গদ্যশিল্পী। তিনি যেভাবে তাঁর গদ্যঢং তৈরি করেছেন তা অনায়াসে পড়ে যাওয়ার গদ্য নয়। এই গদ্য পাঠের সময় সচেতনতা দাবি করে, শব্দের ব্যবহারের উৎস-নির্দেশ এবং বিচার্য খতিয়ে দেখার নির্দেশ করে। ইংরেজি এবং বাংলায় নিজেকে প্রকাশ করার এমন ক্ষমতা বাংলা ভাষার খুব কম লেখকেরই আছে।

এই গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের অগ্রন্থিত লেখাগুলো সংকলিত করার জন্য।

৫ জানুয়ারি ২০১৩ সেলিনা হোসেন

সূচি

শৈশবকালের ঢাকা শহর ১১
একুশের স্বরূপ সন্ধান ১৭
এবং শওকত ওসমান ২০
বিকট নৈঃশব্দ্যে অনুরণিত স্বদেশ : শওকত নেই বলে ২২
শওকত ওসমানের সঙ্গে শেষ পত্র-বিনিময় ২৭
স্মৃতি : শামসুর রাহমান ৩৫
স্মরণে-বরণে প্রয়াত কবি সানাউল হক ৩৮
সৈয়দ নুরুদ্দীন : মনে পড়ে ৪৪
জ্ঞানসূর্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৫০
ওস্তাদ আয়েত আলী খান ৫৪
বিদায়, জনগণের রাজকুমারী ৬০
মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর সামন্তরিক জীবন ৬৬
এখ্‌লাসউদ্দিনের আপন ভুবন ৭০
ঋত্বিক-স্মৃতি ৭৫
হাসনাত আবদুল হাই-এর *সুলতান* ৮০
স্বাধীনতার রক্তঝরা দিন ৮৫
নিঃশব্দ পরিক্রমান্তে সৃষ্টির উল্লাস ৮৮
স্তালিনের মৃত্যু ও মানবতার মুক্তির বোধন ৯১
যুদ্ধোত্তর বিশ্বচলচ্চিত্র প্রসঙ্গে ৯৯
এ যদি অধর্ম হয়, তবে তাই হোক ১০৩
জনতার স্মৃতিশক্তি কম, কিন্তু অতটা কম নয় ১০৫

শৈশবকালের ঢাকা শহর

জীবনের প্রথম দুই দশক কেটেছে পুরোনো ঢাকায়। শৈশব কাটিয়েছি ইসলামপুর অঞ্চলে, বাকিটা তদানীন্তন ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনের পেছনে সিদ্দিকবাজার মহল্লায়। সেসব দিনের কথা মনে করলে কত আবছা স্মৃতি ভিড় করে আসে।

সে সময় থেকে চার দশক পরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রদূত ছিলাম তখন ১৯৮৪ সালের হেমন্তকালে আর্মেনিয়া সফরকালে অপ্রত্যাশিতভাবে শৈশবের ঢাকা স্মরণ করিয়ে দিল মাতেনদারান-এর ১৩ হাজার আর্মেনীয় ভাষার পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগারের পরিচালক। সুপ্রাচীন দুই জাতি-ইহুদি ও আর্মানি–তাদের ইতিহাসও প্রায় সমান্তরাল গতিতে চলেছে; বিদেশি পৌনঃপুনিক আগ্রাসন, গণহত্যার শিকার এবং বহু যুগ ধরে 'ডিয়াসপোরা'র ছত্রখান ছন্নছাড়া মোহাজের অস্তিত্ব যাপন শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। অত্যাশ্চর্য সব পাণ্ডুলিপি নিরিখ করে দেখছি। তার মধ্যে আছে দেড় হাজার বছর পুরোনো আর্মেনীয় ভাষার সর্বপ্রথম সাময়িকী। নাম তার *আজদারার*। মুদ্রিত হয়েছিল ১৭৯৪ সালে দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ শহরে। গ্রন্থাগারের এক পাশের দেয়ালে বিশ্বের মানচিত্র। তাতে রং-বেরঙের পিন গাঁথা, দুনিয়াভর ছড়ানো-ছিটানো যেখানে আর্মেনীয়রা বসত করেছে তার সযত্নে রক্ষিত হিসেব। আমি হেসে বলি, 'কিন্তু একটি পিন নিশ্চয়ই নেই। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরকে যা নির্দেশ করে যেখানে এখনও গুটিকয়েক আর্মানি আছে, উৎকৃষ্ট মানের গালিচা ব্যবসায়ীদের বংশধররা যাদের আদিপুরুষদের বিত্তশালী এলাকার নাম আজও আর্মানিটোলা।'

আমার ভুল ভাঙিয়ে তিনি দেখালেন সেই খুদে পিনটি। আর আমি ফিরে গেলাম আমার শৈশববেলায়।

১৯৩৫-৩৬ সালের কথা। আমি তখন ১০-১১ বছরের হাফপ্যান্ট পরা উৎসুক বালক। আর্মানিটোলার ঘেরাও দেওয়া মাঠে ঘুমভাঙা চোখ ডলতে

ডলতে প্রায়ই প্রাতঃভ্রমণে যাই। বিকেলে চলে যাই খালি পায়ে অ্যাংকলেট পরা খেলোয়াড়দের ফুটবল খেলা দেখতে। আর তার চাইতেও বেশি ঠোঙাভর্তি ঝাল কুড়মুড়ভাজা আর তপ্ত বালিতে সদ্য ভাজা চীনাবাদাম চিবুতে, কখনো কখনো মিটফোর্ড রোডের জুতোর কারিগর চীনাদের ছেলেদের দলবেঁধে ধিক্কার জানাতে– 'চীনা মামু, চোঁ চোঁ।' মাঠের এক প্রান্তে বিশাল জমিদার বাড়ি 'রায় হাউজ'-এর সেগুনকাঠের কারুকার্যখচিত সিংহদ্বারে পাহারারত ভোজপুরী দারোয়ানদের খৈনি ডলে খাওয়া দেখি। আর অন্যদিকে প্রেক্ষাগৃহ 'পিকচার শো হাউজ'-এর বাইরে টাঙানো বিজ্ঞান কল্পকাহিনির নায়ক 'ফ্ল্যাশ গর্ডন' কিংবা ভারতীয় থ্রিলার-রানি নাদিয়ার অতিকায় প্রতিকৃতি দেখি হাঁ করা অবাক বিস্ময়ে। সেই সিনেমা হলের গা ঘেঁষে একটি বিরাট কাঠের বুলন্দ- দরওয়াজা শেকল দিয়ে তালাবন্ধ দেখি সবসময়।

হঠাৎ একদিন সাতসকালে ইসলামপুরের বসতবাড়ি থেকে জিন্দাবাহারের পতিতাপল্লি সন্তর্পণে পেরিয়ে, বাবুবাজার পুল বাঁয়ে রেখে সে দুয়ারের কাছে পৌঁছতেই দেখি কালো আলখাল্লা পরনে সাদা দাড়িগোঁফ মুখে সৌম্যদর্শন এক পাদরি দরজার ভেতরে কাটা ছোট্ট খিড়কি পথে বেরিয়ে আসছেন। সেদিন তার সৌজন্যে আমার জীবনের প্রথম আর্মানি গির্জা সন্দর্শন। যার বয়স ২০০ বছরের বেশি। আর তার লাগোয়া গোরস্থানে এক অদ্ভুত পাথরের জাফরিকাটা ফুলপাতা লতানো ক্রুশচিহ্ন অবাক চোখে দেখি। প্রত্যেকটি সমাধি ফলকে ক্রুশচিহ্নটি উৎকীর্ণ রয়েছে, তবে প্রত্যেকটি অনন্য শিল্পকর্ম– মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যবাহী, নাম তার 'খাচকার' (Khachkar)। তিরিশ দশকের দূর অতীতের এক অপরিণত বয়স্ককে আর্মেনীয় পুরোহিত শোনালেন সেই আদিকাহিনি। তার দেশে আরারাত পাহাড়ের (বর্তমানে তুর্কি দখলে) চূড়োয় এসে ঠেকল হজরত নুহের বজরা। তিনি কোনো অজানা কারণে আর্মানি ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলেন 'এরেভান' বা 'ঐ দেখা যায়'। পরমেশ্বর জেহোভার অর্পিত মহাপ্লাবন শেষে প্রথম শুকনো ডাঙা পেয়ে। তিনি উড়িয়ে দিলেন একটি ঘুঘু পাখি যা পাহাড়ের ঢালুতে জলপাইবীথি থেকে একটি পাতা ঠোঁটে করে এনে পয়গম্বরকে দিয়েছিল। আর যা ঐশ্বরিক ও দানবীয় রোষমুক্ত দুনিয়াজোড়া শান্তির আজও সর্বজনস্বীকৃত প্রতীক। নুহ-উচ্চারিত এরেভান সেই থেকে আর্মেনিয়ার রাজধানী ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। চতুর্থ শতাব্দীতে আর্মেনীরা খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ কিয়েভ–রুশ রাজ্যের ৫০০ বছর আগে।

পুরোনো ঢাকা শহরের অপর প্রান্তে লক্ষ্মীবাজারে দু-দুটো ক্যাথলিক বিদ্যাপীঠে আমার শৈশব-কৈশোরের পঠন-পাঠন পর্ব শেষ হয়। একটি সেন্ট

ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স কনভেন্ট এবং অপরটি সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুল। কনভেন্টে আমার প্রথম জানী-দোস্ত ছিল লেজলী ল্যাজারাস, জাতে ইহুদি, কারণ ক্লাস-ভর্তি মেয়েদের মধ্যে আমরা দুটিমাত্র ছেলে। সেন্ট গ্রেগরি বয়েজ স্কুলে আমার অভিন্ন আত্মা ছিল মোজেস লেভি। সেও ইহুদি। মোজেসদের বাড়িতে গেছি নবাবপুর সড়ক থেকে বসাকদের ঘিঞ্জিপাড়ার সরুগলিতে। তার মাকে মনে পড়ে, দেয়াল-কুলুঙ্গিতে সযত্নে রক্ষিত ধর্মগ্রন্থ তোরাহ ও তালমুদ, পাতা উল্টে তা থেকে সুললিত ও গম্ভীর হিব্রু ভাষায় তেলাওয়াত করতে। মহিলা ওই একটি মাত্র ভাষাই জানতেন। তাঁদের অগুনতি পূজা-পার্বণ উপলক্ষে নিজের হাতে তৈরি হরেকরকম মিষ্টান্ন খাওয়াতেন পরম আদরে। এখনও মনে পড়ে তাঁর চোখের নির্বাক ভাষায় অফুরান স্নেহের নির্ঝরিণী যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি আমাদের বাড়ির উঠোনে শানবাঁধানো কুয়োর গভীর কালো জলের অতল বিষণ্নতার অচঞ্চল রূপ। মোজেসের মারফত আমার প্রশ্নের উত্তরে তার মা বলেছিলেন, 'আমরা আজ দু'হাজার বছরের ওপর মহাপ্রভু জেহোভার অভিশাপে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, নির্বাসিত। আমাদের মাঝে সুখ ও আনন্দ খোঁজা বৃথা, কখনো পাবে না।' সেই একই প্রগাঢ় বিষণ্নতা প্রত্যক্ষ করেছি আর্মেনীয় বৃদ্ধ পাদরির দু-চোখে। তিনি বলেছিলেন যে, 'এটা আমাদের ইতিহাসের বিষাক্ত অভিশাপ।'

একদা দোর্দণ্ড প্রভাবশালী দুটি জাতির অভিশপ্ত ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু জীবনের আশাহীন যন্ত্রণা ও সীমাহীন নৈরাশ্য আজও স্মৃতিপটে প্রোজ্জ্বল সেই পুরোনো ঢাকার আর্মানিটোলার পথে পুরোহিতের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ও অন্ধগলির জরাজীর্ণ কুঠুরিতে উপাসনারত মায়ের ক্লান্ত মুখচ্ছবিতে।

সেই শৈশব-কৈশোরের মফস্সল শহর ঢাকা কত হরিষে বিষাদে ভরা। বিদেশি বিজাতীয় গোত্রভুক্ত মানুষের প্রতি তখন দ্বিধাসন্দেহ ছিল। অন্ধ জাতিগত বিদ্বেষ ও যুক্তিবর্জিত ক্রোধ তখনো গণমানসে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠেনি। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষ রোপণে তখনো ঢের দেরি। সে যুগ অসহযোগ খেলাফতের যুগ। অগ্নিযুগের অঙ্গার-সেঁকা চেতনার উন্মেষের কাল। মওলানা মহম্মদ আলী-শওকত আলীর নামডাক, তাঁদের সম্মান ও গান্ধী-আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের আকর্ষণ তখন তুঙ্গে।

স্মৃতিপটে এখনও আঁকা দীর্ঘদেহী অপরূপ সুন্দরী দুঃস্থ এক ইরানি মহিলার ছবি, বয়সের ভারে এখনও অবনত নন তবু একটা সুদৃশ্য খোদাই করা আখরোট কাঠের ছড়ি হাতে তৎকালীন রইস-পরিবারে আনাগোনা তাঁর। খ্রিষ্টান ধর্মযাজিকাদের মতো, যিশুমাতা মেরির মতো সাদা কাপড়ের শিরস্ত্রাণ পরা রাঙা মুখ, আর সাগর-নীল আয়তদৃষ্টির সম্মোহনে আমাদের হৃদয়

আবিষ্ট। শুধু সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অনমনীয় বিচারে তিনি 'নষ্টা মেয়েমানুষ'। অপরাধ তার নাকি তাঁর রূপে মজে কোনো তরুণ ব্যারিস্টার তাঁকে বিয়ে করে এনেছিলেন। কিন্তু আমাদের অপরিণত সমাজে স্বামী-পরিত্যক্তার কলঙ্ক অপরিমেয়। স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন আশরাফ গোত্রীয়দের নিত্যনৈমিত্তিক নির্দোষ বিলাস মাত্র!

আরও মনে পড়ে সিদ্দিকবাজারে কাবুলিওয়ালাদের একটি বাড়িতে মেস করে থাকা ও কখনো কখনো দুর্বোধ্য পশতু ভাষায় তাদের সমবেত সংগীতের রেশ ও রুমালনৃত্যের গমকে পাড়া প্রকম্পিত। রাত জেগে জেগে ভাবতাম এসব আফ্রিদি পরিবার-পরিজন ছেড়ে বন্ধুর পাহাড়ি পথে উটের কাফেলা নিয়ে রুজির তল্লাশে বেরিয়ে পড়েছে। এদের সম্পর্কে ভীতি ছিল সর্বজনীন, কারণ চক্রবৃদ্ধি হারে চড়া সুদে এরা টাকা ধার দিয়ে নাকি আদায়ের সময় এলে গলায় গামছা বেঁধে বেদম পেটাত সে কর্জ আদায় না করতে পারলে। তাদের কাঁধের ঝুলি ভরা থাকত কত বিচিত্র রূপের মণিমাণিক্যে যা ফেরি করে বেড়াত তারা। আমার বাবার পরিচিত এক খানসাহেব ছিলেন আফগান সীমান্তের উপজাতীয় দাউদ জাই গোষ্ঠীভুক্ত খান আবদুল জমরুদ খান। তারা দুজনে প্রায়ই সকালবেলায় ভাঙা ঢাকাই উর্দুতে কুশল বিনিময় করতেন এবং দরজার আড়ালে আমাকে দেখতে পেলেই জমরুদের বাঘের মতো থাবায় মুঠোমুঠো শুকনো আলু বোখারা, কিশমিশ, মনাক্কা আমার ভাগ্যে জুটত। আমার আব্বা এই পাঠান পড়শিদের বিনি পয়সায় চিকিৎসা করতেন। তাই ডাক্তারের স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে জমরুদ তাকে উপহার দিয়েছিল একটি বৈদুর্যমণি বসানো রুপোর আংটি।

ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের গা ঘেঁষে উড়িয়া মুটেদের বস্তি। তার পাশেই আমাদের ছোট্ট একতলা বাসা। লোকে অহেতুক তাদের সরলতাকে বোকামি ভেবে গাল দিত। 'আহাম্মক ব্যাটা মাড়ুয়া।' এই ভর্ৎসনাসূচক পদবিটা কী করে বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল তা বলা মুশকিল। কারণ কলকাতার বড়বাজারের মাড়োয়ারি জাঁদরেল ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছাড়া বহিরাগত খেটে খাওয়া মানুষ কেউই মাড়ওয়ারের ঊষর প্রান্তর থেকে আসেনি। ঘুমের ঘোরে ট্রেনের তীক্ষ্ণ বাঁশি চিড় ধরাত সেই গানের আর্তিতে। এখনও মনে পড়ে একটি গানের কলি গভীর আবেদনে ভরা- 'বাপ মা তেরা জারু লাড়কা কোইভি নাহি তেরা আপনা'। ফাল্গুন মাসে সারারাত সেই মাড়ুয়া বস্তিতে মাদল বাজিয়ে গান চলত পচাইয়ের কড়া নেশায় দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর। তবে এ তিরস্কারের মধ্যে করুণা মিশ্রিত মাড়ুয়া বলে ভর্ৎসনার কোনো

উত্তাপ, কোনো বিজাতীয় ঘৃণার ছাপ ছিল না। শুধু ছিল বাঙালির অলীক আত্মাভিমানের নির্বোধ পরিচয়।

সেই নির্বুদ্ধিতার ক্রমবিকাশ চোখের সামনেই দেখতে দেখতে বেড়ে গেল তিরিশের দশকের মধ্যপাদে। ইসলামপুরে তখন হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান। আমরা বাবুপাড়া থানা গা-ঘেঁষা 'কালাচাঁদ', 'গন্ধবণিক' ও 'সীতারাম মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর মিঠাই-মণ্ডা, প্রাণহরা বরফি, পাতক্ষীর, আমসন্দেশের প্রত্যাশায় তীর্থের কাকের মতো প্রহর গুনতাম। আমপট্টির আকালী সাহার আমৃতির অমৃততুল্য স্বাদ ও সুখ্যাতি তো কলকাতার ভীমনাগ ও দ্বারিকের নামডাককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ হঠাৎ দেখা গেল নয়াবাজারে সদ্য খোলা ইসলামী ভাণ্ডার থেকে অখাদ্য তথাকথিত মিষ্টান্ন আসছে আমাদের কাজীবাড়িতে। আমরা নবীনের দল কিন্তু আনুগত্যে অটল থেকে গেছি। শাঁখারীপট্টি দিয়ে লক্ষ্মীবাজারে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের উদ্দেশে যাবার পথেই কালাচাঁদ-সীতারামের কাঁঠাল পাতার ঠোঙায় অমৃত সেবন করতে করতে পথ চলতাম। ফিরতাম প্রায়ই সদরঘাটের কূল ঘেঁষে পাটুয়াটুলীর পথ ধরে যেখানে বস্ত্রালয় ও সোনারুর দোকান সবই বংশানুক্রমে হিন্দুদের ছিল। মনে আছে বিয়ে-শাদি লাগলেই ননী স্যাকরা ও তদীয় পুত্র গোপাল কলকাতার এমবি সরকারের গয়নার সচিত্র ঢাউস ক্যাটালগ নিয়ে হাজির হতো এবং একটা জ্বলন্ত কয়লার মালসাতে সোনা গালিয়ে নিক্তিতে ওজন করে প্যাটার্ন মাফিক সোনা জড়োয়ার গয়নার অর্ডার নিত। পরে তৈরি করা কড়া, চুড়ি, আর্মলেট, বাজুবন্ধ, হাঁসুলি, মল, ঝুমকো, নথ, মাথার টিকলি ওজন মেপে দিয়ে যেত বাড়ি বয়ে এসে।

বেনারসি, জামদানি ও চিকনের কাজ করা মসলিন আসত বস্ত্রভাণ্ডার থেকে। শুধু আচকান চাপকান শেরওয়ানি কিংখাব পাঞ্জাবি চুড়িদার আর তাংপাজামা তৈরি করতে মাপ নিতে আসত গলায় মাপের ফিতা ঝোলানো বশীর খলিফা। আর আতর ও গোলাপজল খুশবুদার পানের জর্দা আসত আমপট্টির সাঈদুল্লাহর আড়ত থেকে।

দেখতে দেখতে কিন্তু পরিবেশ বিষিয়ে ফেলল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। মুসলমান ছেলেদের অভ্যস্ত ছড়ায় বৈচিত্র্য সংযোজিত হলো : 'এক দুই তিন–ভারত স্বাধীন/ দশ এগারো বারো– গান্ধী শালাকে মারো।'

মহরমের মিছিল, দুর্গাপূজার আয়োজন সবই ব্যাহত হতে লাগল প্রতিপক্ষের আক্রমণে। মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাজনা বাজিয়ে যাওয়া উপলক্ষে রক্তাক্ত দাঙ্গা হয়ে উঠল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর হিন্দু মন্দিরের পবিত্রতা গরু জবাই করে কলুষিত করা দাঙ্গাকারীদের আকাশবিদারী স্লোগান

জনপ্রিয় হয়ে উঠল, 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর'; আর তারা পাল্টা জবাবে গলা ফাটানো 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি। দেশমাতৃকা ও পরম করুণাময় অধোবদন হলেন এই পাশব উন্মত্ততায়। পাড়ায় পাড়ায় সাজসাজ রব। দিকে দিকে আগুনের লেলিহান শিখা, পথে পথে নিরীহ পথচারীর ছুরিকাহত গলিত লাশ।

সেই একদার আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শহর '৪০-এর দশকে বিভীষিকা- নগরীতে রূপান্তরিত হলো। আর আমাদের ব্যথিত কিশোরচিত্ত যে যন্ত্রণায় মথিত হয়েছিল সেকালের ঢাকা শহরে, তা এই বার্ধক্যের শেষ প্রান্তসীমায় আজও বৃথাই প্রত্যক্ষরত রবীন্দ্রনাথের সেই প্রত্যাশার : 'তামসী তুলিকায় অতীতের বিদ্রুপ বাণী দিক মুছায়ে/স্মরণের পত্র হতে।'

সেই অভিশপ্ত প্রজন্মের আমরা আর সেই অকাল পঙ্গুদশা হতে জীবনভর চেষ্টা করেও আর শৈশব-কৈশোরের সুস্থ সহজ মানবিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার করতে পারিনি। মানবতার বিরুদ্ধে আমাদের সেই অমার্জনীয় অপরাধ, সেই আত্মঘাতী দ্বিখণ্ডিত অসামাজিকতা নিরপরাধ উত্তরসূরিদের জীবনও বিষিয়ে তুলেছে, তাদের স্বস্তি, তাদের নিছক অস্তিত্বকেও করে তুলেছে বিপন্ন– নিশ্চিতভাবে ধ্বংসমুখীন।

আজও তাই চেতনার সুস্থতা অর্জন করার নিষ্ফল প্রয়াসে আঁকড়ে ধরি সেই লেজলী ল্যাজারাস, মোজেস লেভি, জমরুদ খান আর মাড়ুয়া সম্প্রদায়ের অনায়াস অস্তিত্ব ও অনাবিল জীবনকে। সেই ঢাকা শহরে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সুবিধাবাদিতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যবিকৃতি আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে খালি আক্ষেপ হয় যে সুবর্ণা মুস্তাফা রূপায়িত দূরদর্শন-নাটকের নায়িকার মতো কেন আমরা আজ বলতে পারছি না, 'ছি, ছি, থু।'

প্রথম আলো, ২১ জুলাই ২০০০

একুশের স্বরূপ সন্ধান

শ্রীকান্তের ভাষায়, "জীবনের অপরাহ্ণবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটি অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।"

কিন্তু সত্তর বছর বয়সের দোরগোড়ায় পৌঁছে গতকাল কী ঘটেছিল, পরশু কার সাথে দেখা হয়েছিল তা প্রায়ই সম্পূর্ণ ভুলে গেলেও, কত সাম্প্রতিক কথা মনে না পড়লেও, জাতীয় মানসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত বিশেষ কয়েকটি দিন, যাকে 'দিবস' বলে সম্মানিত করি তা যেন কোনো দৈববলে ক্রমশই উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এসব পরম লগ্নের মধ্যে রয়েছে ১৯৪৮-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি, যেদিন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে সমুচিত মর্যাদার স্বীকৃতিদানের জন্য ৭১-এর শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের অধিবেশনে জোর দাবি তুলেছিলেন; ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ ও ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন; ১৯৬৬-এর বাঙালির মুক্তিসনদ 'ছয়দফা'র আপসহীন ঘোষণা শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল পাঞ্জাবের রাজধানীর বৈরী পরিবেশে; ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান; ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ-এ শেখ মুজিবের 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এ যার যা হাতে আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান; ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ-এ মরণপণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল সূচনা; ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়; ১৯৮০র দশকের শেষ পাদে স্বৈরাচারবিরোধী সম্মিলিত আন্দোলনের গণজোয়ার এবং অতি সম্প্রতি ঘাতক দালাল মোল্লাবাদের বিরতিহীন বিষের বাঁশি শুনে বিভ্রান্ত বাঙালিকে স্বমহিমায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য মুমূর্ষু শহিদ জননীর শেষ নির্দেশ।

সেই কোন যুগ আগের ফেব্রুয়ারি মাসটি আজ স্পষ্ট মনে পড়ছে। তখন আমি সুদূর অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম শহর সিডনিতে কলম্বো প্ল্যানের আওতায়,

প্রেষণে তাদের জাতীয় সম্প্রচার কমিশনের কেন্দ্রীয় সংবাদ সংগঠনে প্রশিক্ষণ ও কর্মরত। তারিখটি মনে হয় ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। এবিসি-র প্রচলিত রীতি ছিল যে, পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত সনদের শর্ত মোতাবেক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে তার ছয় শতের অধিক নিজস্ব সংবাদদাতার মাধ্যমে মহাদেশের নগর বন্দর এমনকি জনবিরল প্রত্যন্ত এলাকার খবরাখবর সংগ্রহ করে, তার সত্যতা অনুপুঙ্খ যাচাই করে সম্প্রচার করা। বিশ্বাসযোগ্য স্থানীয় সংবাদপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে পরিবেশন করার দায়িত্ব নিলেও বিদেশি খবর সিডনিতে পাঠানোর দায়িত্ব ছিল লন্ডনস্থ ব্যুরোর। তারা দুনিয়ার সব সংবাদ সংস্থার প্রেরিত খবর ছানবিন করে, সম্পাদনা ও পুনর্লিখন করে সম্প্রচারযোগ্য আকারে পাঠাতেন। সেদিন প্রত্যুষের শিফটে কাজ করছি, এমন সময় বিরাট সংবাদকক্ষে দমকা হাওয়ার বেগে প্রবেশ করলেন বহির্বিশ্ব ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রিস্টোফার ও'সালিভান। হাতে তাঁর লন্ডনের টেলিপ্রিন্টার মেশিন থেকে ছিঁড়ে আনা 'মেসেজ'। ঘরে ঢুকেই আইরিশদের চরিত্রগত উত্তেজনায় কাগজের টুকরাটি পতাকার মতো ঊর্ধ্বে দোলাতে দোলাতে চেঁচিয়ে বললেন, 'স্টুডেন্টস গানড ডাউন ইন পাকিস্তান!' কিন্তু প্রাপ্ত খবরটিতে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত না হওয়ায় এবং পাকিস্তান সরকারের মন্তব্যসমূহ সুস্পষ্ট একদেশদর্শিতাদুষ্ট পরিগণিত হওয়ায়, তাকে পুনঃসম্পাদনার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃত্বের আজ্ঞাদাস বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীর আমলে বাঙালি ছাত্র-জনতাকে শেয়াল কুকুরের মতো ঢাকার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করার মর্মন্তুদ সংবাদে শোকে মুহ্যমান না হয়ে বরং অদ্ভুত এক উদ্দীপনার তড়িৎস্পর্শে টান-টান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, এখনও স্মরণে পড়ে। 'ভারতের পাকিস্তান ধ্বংসের কারসাজি', 'হিন্দুদের উদ্দেশ্যমূলক অন্তর্ঘাত', 'কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র' ইত্যাকার সরকারি বাঁধা গৎ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল ১৯৪৮ এর প্রথম ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারারুদ্ধ হবার সুবাদে। জঘন্য মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের ধূম্রজাল ছিন্ন করে প্রকৃত সমাচারটি বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে সেদিন নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল। খেদও ছিল যে, একুশেতে মোহগ্রস্ত বাঙালির সুপ্তোত্থিতি যে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সূচনা করল তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হলো না।

অতঃপর সিডনি, মেলবোর্ন, ক্যানবেরা, পার্থ, অ্যাডিলেডসহ যেখানেই গেছি সেখানেই ঘরোয়া বৈঠকে মুক্তবুদ্ধি সাংবাদিক, বিশ্লেষক, বুদ্ধিজীবীদের নিকট আমাকে একুশের তাৎপর্য ও পাকিস্তানের নওআবাদি রাজনীতির স্বরূপ বোঝাতে হয়েছে। উত্তরকালে তার মাশুলও আমাকে শুধতে হয়েছিল যখন

'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র গুরুতর অভিযোগে আমাকে পেশ করা হয় ঊর্ধ্বতন পাঞ্জাবি আমলা নিয়ে সংগঠিত 'স্ক্রিনিং কমিটি'-র এজলাসে। কিন্তু তার দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক দিকও ছিল। আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ওপরে বহু অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী আমাকে লিখে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ১৯৫২ সনে তাঁদের চক্ষু উন্মীলন করার জন্য। তার ফলে নাকি আমাদের পৌনঃপুনিক সংগ্রাম ও আত্মাহুতির অবিকৃত সত্যরূপ তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও তাই আমি পরিতৃপ্ত যে, এবিসি-র সেন্ট্রাল নিউজ রুমে ঘটনাচক্রে 'সেখানে ছিলেম আমি।'

আজ যারা বাঙালি জাতির গৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাসকে বিস্মৃতির কালো কাফন দিয়ে ঢেকে দেবার অপচেষ্টা করছে, তারা নিজেদের অতীত বেইমানি আড়াল করতে তৎপরই শুধু নয়, বরং আত্মবিস্মৃত জাতিকে বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের চোরাবালিতে ডুবিয়ে মারতে বদ্ধপরিকর। আপসহীন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালিকে অতি সুপরিকল্পিতভাবে তারা অপদেবতার অন্ধ পূজারি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে আমাদের নিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নস্যাৎ করতে আপ্রাণ চেষ্টায় রত। আর তাদের রুখতে হলে আমাদের আত্মপরিচিতির দীর্ঘ দুর্গম পথে অভিযাত্রার রক্তস্নাত মাইলফলকগুলো নতুন করে শনাক্ত করে লক্ষকোটি প্রাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। একুশকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এজন্যই এত প্রয়োজন, কারণ আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গের সেই স্ফটিকস্বচ্ছ আরশিতে নিজেদের স্বরূপ আমরা নিরন্তর অবলোকন করে সাহস সঞ্চয় করতে পারি আগামীর বাঁচার বহু লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

এবং শওকত ওসমান

সার্থক নাম সেই গণ্ডগ্রামের–হুগলি জেলায় সবলসিংহপুর। কারণ সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন এক সিংহপুরুষ–শওকত ওসমান। তারিখ ২রা জানুয়ারি, ১৯১৭ সাল। অর্থাৎ সেই বিশ্বকাঁপানো দশদিনের দশ মাস আগে। তাই রঙ্গচ্ছলে বলি, মহান অক্টোবর বিপ্লবের প্রথমে প্রসববেদনার ফসল সেই জানুয়ারির নবজাতক; দলিত মানুষের মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ব্রত উভয় ক্ষেত্রেই। আপন পরিধিতে শওকত ওসমান বিগত ছয় দশকে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির মঞ্চে প্রবাদপ্রতিম নায়কের দুঃসাহসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ; মুক্তবুদ্ধি, বিজ্ঞানমনস্কতা, ইহজাগতিকতা, অসাম্প্রদায়িকতার স্বপক্ষে জান-কোরবান লড়াই করে জাতীয় ও মানবমুক্তির বাণী প্রচার করেছেন, তার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে প্রথম সাক্ষাৎ আমাদের। মুক্তবুদ্ধির সাধক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শওকত ওসমানকে তিনিই আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মত ও পথের আশ্চর্য মিলের দরুন আট বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ শওকত বড় সহজেই– 'তুমি'র পর্যায়ে উপনীত হলেন। বহু উত্থান-পতনের মাঝেও আমাদের সহমর্মিতায় এক মুহূর্তের জন্যও কোনোদিন চিড় ধরেনি। ১৯৭৫ সনের ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পর যখন তিনি ঘৃণাভরে খুনিদের নিরাপদ নিরঙ্কুশ অবাধ লীলাভূমি ত্যাগ করে স্বেচ্ছানির্বাসনে যান তখন আমার বিচরণভূমি লন্ডন থেকে তাঁকে কলকাতায় লেখার সময় আমি ও অন্যরাও তাঁর পিতৃদত্ত 'শেখ আজিজুর রহমান' নামটি ব্যবহার করতাম। আজ এতদিন পরে তাঁর জনপ্রিয় ব্যঙ্গকবিতার শিরোনাম হলো 'শেখের সম্বরা'। এক অর্থে ৮২ বছর বয়সে ৮০'র বেশি পুস্তক প্রণয়ন করে তিনি যখন প্রায় কবিগুরুর রেকর্ড ভাঙতে উদ্যত এবং সকল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট পুরস্কার-পদক পাওয়ার পরও আমার পঞ্চাশ বছরের পুরাতন

বন্ধুর শিশুসুলভ সারল্য, আদর্শগত অনমনীয়তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি।

'মনেপ্রাণে বাঙালি হ' এই মর্মে গুরুসদয় দত্তের আহ্বানকে নেচেকুঁদে আমাদের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলেন 'মিস্টার বেঙ্গল' পটুয়া কামরুল হাসান, যিনি আমাদের গোষ্ঠীর অভিন্নাত্মা, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সেই মনেপ্রাণে বাঙালি শওকতের যে গুণটি আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করেছে তা হলো তিনি শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদে অবিচল আস্থাই রাখেননি, সেইসঙ্গে বিশ্বাস করে এসেছেন চণ্ডীদাসের অমর বাণীতে 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই।' তাই যেখানে মানবতার অপমৃত্যু, অবমাননা হয়েছে তা বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসরায়েল যেখানেই হোক না কেন সেখানেই শওকত ওসমান সিংহনিনাদে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৭১ সনে অবদমিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন উগ্ররূপ ধারণ করতে উদ্যত তখনো মানবকল্যাণে দীক্ষিত শওকত অবাঙালি ও ভিন্ন ভাষাভাষীদের নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত কিন্তু সক্রিয় তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে শওকত ওসমানের অসামান্য প্রতিভাধর ছাত্র, মরণব্যাধি ক্যান্সারে অকালপ্রয়াত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথা উদ্ধৃত করা অতি প্রাসঙ্গিক।

> বাংলাদেশের বিহারি সম্প্রদায়ের সীমাহীন দুর্দশার কথা মনে হলে আমার চোখে কিন্তু জেনেভা ক্যাম্পের ছবি আসে না। বরং যখনই জেনেভা ক্যাম্পের ওদিকটায় যাই, গোটা এলাকার ওপর ক্রেন ছাড়াই আকাশ থেকে ঝুলতে থাকে একটা মালগাড়ির অন্ধকার ওয়াগন। সেখানে ঘরকন্না করে একটি বিহারি পরিবার। অন্য দেশে তাদের দেশ ছিল, সেখানে বাপদাদার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা এখানে এসেছে। এখানে তাদের ঘর জোটেনি, পায়ের নিচে মাটিও পায় না তারা। মালগাড়ির পরিত্যক্ত ওয়াগনে তাদের বসবাস, দুইবেলা দুমুঠো খাবার জোটে না। এক প্রজন্মে দুবার বাস্তুচ্যুত এই সম্প্রদায় নিয়ে আরও গল্প এখানে লেখা হয়েছে। কিন্তু নিজের মাটি থেকে ওপড়ানো মানুষের শেকড়-ছেঁড়া চেহারা শওকত ওসমানের 'গেহু' গল্পে যেমন প্রকট, অন্য কোথাও তার ছায়াও দেখেছি বলে মনে হয় না।

এমন সংবেদনশীল ও সংগ্রামী সফরসঙ্গী, হামসফরকে জানাই হাজার সালাম।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৯৮

বিকট নৈঃশব্দ্যে অনুরণিত স্বদেশ : শওকত নেই বলে

দিল্লির সেই একই হাসপাতালে ঠিক এক বছর আগে মরণরোগ ক্যান্সারের অহেতুক বিলম্বিত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। কালবিলম্ব না করে প্রখর কিন্তু অদৃশ্য রশ্মিবিকিরণে কোষের অবাধ বিস্তৃতিকে আয়ত্তে আনলেন তরুণ বাঙালি বিশেষজ্ঞ সার্থকনামা সুদর্শন দে এবং রাসায়নিক চিকিৎসাবিদ আনন্দী জহুরি কেমোথেরাপি দিয়ে ভবিষ্যৎ সংক্রমণ সীমিত করায় সচেষ্ট হলেন।

এ যাত্রায় আবার ফুসফুসের বহুলাংশে সংকোচন ও রশ্মিবিকিরণগত ফাইব্রোসিস- সৃষ্ট অবাধ্য কাশি ও আনুষঙ্গিক শ্বাসকষ্টের কারণ অচিরেই শনাক্ত হলো : ফুসফুস সংকুচিত হবার ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানে জলের প্রকোপ। Nature abhors vacuum! বেশ কিছুদিন হলো আমি "শুনি ক্ষণে ক্ষণে অতল জলের আহ্বান।" রঞ্জনরশ্মির নিষ্করুণ আলোকচিত্রে সহজেই ধরা পড়ল সেই প্লাবনধারার বিস্তৃতি। কর্কট রোগের ম্যালিগনেন্ট কোষের পুনঃসংক্রমণের ভয়ে হাস্যরসের আশ্রয় নেই। সিস্টার টমাসকে বলি সে কাহিনি। লন্ডনের হার্লি স্ট্রিটের বিশেষজ্ঞ স্কটল্যান্ড নিবাসী বৃদ্ধ রোগীর রোগনির্ণয় করে রায় দিলেন–'প্লুরোসি'। অর্থাৎ ফুসফুসে জল। আজীবন স্কচ হুইস্কি বিনা পানিতে স্রেফ বরফ দিয়ে খেতে অভ্যস্ত রোগীর হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়–ওহ নিশ্চয় তবে বরফই দায়ী। কারণ জল স্পর্শ তো করিনি জীবনে! যাক, আণবিক চিকিৎসা বিভাগের প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দরী ডা. স্নেহ ভার্গভ আপাদমস্তক অস্থি বিভীক্ষণ বা বোন স্ক্যান করে জলের গভীরতা ও সীমারেখা এঁকে দিলে ফুসফুসসংক্রান্ত জটিলতা মোকাবেলায় সিদ্ধহস্ত প্রফেসার গুলেরিয়া দুই দফায়

দেড় সেরের বেশি (১৫০০ সি.সি.) জল বিশাল সিরিঞ্জের মোটা সুচের সাহায্যে বের করলেন। গাঢ় হলুদ খড়ের রং দেখেই গুলেরিয়া ও আনন্দী সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে অধুনা নিরাময়যোগ্য যক্ষ্মারোগ হয়েছে আমার। অনেক সময়েই নাকি র‍্যাডিয়েশন ও কেমোথেরাপি প্রয়োগজনিত ব্যাধির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার হ্রাস ও দীর্ঘকাল স্টেরইড সেবনের ফলে আমাদের মতো উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

গত বছর সুদীর্ঘকাল অনির্ণীত রোগনির্ণয়ের প্রয়োজনে ঢাকা ত্যাগ করার আগে অর্ধশতাব্দীর অটুট বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ শওকত ওসমানকে ফোন করলাম। বললাম যে আমার সন্দেহ যে অর্ধেক জীবন চিমনির মতো বিরামহীন ধূমপান করার ফলে আমার খুব সম্ভব ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছে। আমার ভোজনবিলাস ও আরামপ্রিয়তার জন্য ও ধরেই নিয়েছিল যে আমার হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হবে। তাই আঁতকে উঠে বলল, 'জাস্ট ইম্যাজিনভ।' এ তাঁর এক মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, অবাক হলে কিংবা হঠাৎ শক পেলে ইংরেজি শব্দাবলি রুশ কিংবা অন্য সংস্করণে উচ্চারণ করত। আমি বললাম যে, না হয় ইংরেজরা দু'শ বছর শোষণ শাসন করে গেছে তবু শেকসপিয়রের ভাষার লেহাব করা উচিত। এই সেদিন শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে লন্ডনের হাইনেম্যান প্রকাশনী, সেখানেও লেখকের জেদাজেদির ফলে ইংরেজিতেও শিরোনাম রাখা হয়েছে 'জননী'। বললাম এত সহজেই কি কোনো বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়? তাহলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ব্যর্থ হলো কেন বাংলাতে উর্দু ফারসি আরবির সয়লাব বইয়ে দিতে?

দিল্লির আরোগ্য নিকেতন হতে অদূরে কুতুব মিনার প্রচণ্ড দাপদাহের উষ্ণ হাওয়ায় দুলছে দেখতে পেলাম। মনে পড়ে গেল গত বছর এখানে থাকার সময়েই শওকত ওসমানের শেষ চিঠি পাবার মুহূর্তেই তাঁর স্ট্রোক হবার সংবাদ পাই। ১৩ মে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার আগে দীর্ঘ ৪৬ দিন ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিস্তব্ধ নিথর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। অর্থাৎ এক বছরের অধিক সময় তাঁর দৈনিক প্রাত্যুষিক সম্ভাষণ 'ভ্রাতঃ প্রাতঃস্মরণ' আর কানে ভেসে আসে না। এই এক বছরাধিককাল তাঁর সাপ্তাহিক 'শেখের সম্বরা' 'মিঞা-কী-গাজন', 'রাহনামা' প্রকাশিত হয় না। সঞ্জীবনী সুধার অভাবে যেন আমাদের চেতনা সংগ্রামী প্রেরণা হারিয়ে